পূর্ব থেকে পশ্চিম

পর্বঃ ৫

ওয়াশিংটনের ‘Dulles’ বিমানবন্দরে বলতে গেলে খুব দ্রুতই ইমিগ্রেশান পার হয়ে গেলাম। সব জিনিসপত্র নিয়ে যখন চেক-ইন করতে গেলাম, সেখানে বসে থাকা ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করল, ‘কোন দেশ থেকে এসেছি।’ আমি ‘বাংলাদেশ’ বলতেই চোখেমুখে এমন একটা উত্তেজনা নিয়ে ‘ওহ, বাংলাদেশ!!!’ বলল, মনে হলে তার শ্বশুরবাড়ী বাংলাদেশের কোন এক নাম না-জানা পাড়া-গাঁয়ে। আমি মনে মনে বলি, ‘আপনি ভুল লোকের কাছে উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন ম্যাডাম। আপনাদের এইসব বাহারী এক্সপ্রেশানের সাথে লোকটা ভালো করেই পরিচিত।’ আমি ঠিকই জানি, আমি যদি বলতাম আমি ‘পাপুয়া নিউগিনি’ থেকে এসেছি, তাহলেও সে এই একইরকম উত্তেজনা দেখিয়ে বলত, ‘ওহ! পাপুয়া নিউগিনি, আই লাভ দ্যাট কান্ট্রি’। তারপর আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘Do you have any mate with you?’ আমি ভাবলাম ‘mate’ বলতে আবার কি বুঝাচ্ছে। ‘সঙ্গী-সাথী’ মানে ‘বউ-টউ’ জাতীয় কিছু হবে মনে হয়। তাড়াতাড়ি বললাম, ‘No’। শুনেই খুশি মনে আমাকে যেতে বলে দিলেন, আমিও সামনে চলে গেলাম। পরপর অনেকজনকে যখন একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে তখন আমি বুঝতে পারলাম, আসলে ‘mate’ না, জিজ্ঞেস করছে সাথে ‘meat’ বা ‘মাংস’ জাতীয় কিছু আছে না কি? হায় খোদা! কোথায় ‘meat’ আর কোথায় ‘mate’। তবে মনে মনে এই ভেবে খুশি হলাম যে, ‘Yes’ আর ‘No’ এ-দুটো শব্দ দিয়ে আপাতত কাজ চালিয়ে দেয়া যাবে। যাই জিজ্ঞেস করুক, হয় বলব ‘Yes’, নয়তো বলবো ‘No’।

এত লম্বা একটা ভ্রমন দেব অথচ একবারও ঝামেলা পাকাবো না, এটা ভাবতে নিজের কাছেইতো খারাপ লাগে। মনে হয় এরকম বিরক্তিকর রকমের গোছালো মানুষ হলেতো জীবনটা একঘেঁয়ে হয়ে যাবে। অভ্যন্তরীণ ইউনাইটেড এয়ারয়েজের ফ্লাইট আরো পাঁচ ঘন্টা পরে। তাই মনের সুখে এয়ারপোর্টের আনাচে-কানাচে ঘুরতে লাগলাম। আসপাশে নানা-দেশীয় সাদা চামড়ার লোকজন। তাদের দেখে আমার ছোটবেলায় পড়া সেই কবিতার লাইন মনে পড়ে যাচ্ছিলো, ‘কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবার সমান রাঙ্গা’। আমি কালো সেই জন্য নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম না; বরং ওরা এমন বিশ্রী রকমের সাদা যে তাদের কে সান্ত্বনা দিয়ে কবিতার লাইনগুলো ভাবছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, ‘তোমরা দুঃখ পেয়োনা, তোমাদের চামড়া বিশ্রী রকমের সাদা হয়েছেতো কি হয়েছে, কপালগুণে আমরা হয়তো সাদা হয়নি, তাতে কি? আমাদের রক্তের রংতো একই রকমের লাল।’ নতুন নতুন যা দেখছি তাতেই অবাক অবাক লাগছে। তারপরও বারবার মনে মনে বলছি কই অবাক হবার মত কিছুইতো পাওয়া যাচ্ছেনা। আসলে নতুনের প্রতি মানুষের আকর্ষণতো চিরকালের। সে-

আকরষণ এড়ানো অসম্ভব। এদিক-সেদিক ঘুরে ফিরে একঘন্টা আগে গিয়ে ইউনাইটেডের লাইনে দাঁড়ালাম। পাক্কা একঘন্টা আগে লাইনে দাঁড়িয়েও কোনাভাবেই প্লেন ধরা সম্ভব হলো না। সবসময় যা হয় অর্থ্যাৎ মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য প্লেন মিস করলাম। কে জানতো এখানকার অবস্থা এতই খারাপ যে, একঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েও কাজ হবে না। অতএব, চম□কার একটা ঝামেলা করেই ফেললাম। আমি জানবার কথা নয় যে, এখানকার অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট আমাদের ফার্মগেট রুটের ৮ নাম্বার গাড়ির মত, আর তাতে প্রতিনিয়ত হাজার লোক চলাচল করে।

সিকিউওরিটি চেকিংয়ের পর এয়ারপোর্টের ভিতরে ইউনাইটেডের কাউন্টারের ভদ্রমহিলার কাছে এগিয়ে গেলাম। আমার সামনের লোকটাও প্লেন মিস করেছে। তাকে আবার নতুন করে টিকিট কাটতে হবে। নতুন করে টিকিট করার জন্য যে টাকাটা খরচ করতে হচ্ছে তার অর্ধেক পরিমাণও মন খারাপ করিয়ে দেবার জন যথেষ্ট। মনে মনে নিজেকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম, ‘এটা আমার দোষ না’। মন বলে, ‘তোমার দোষ’। কাউন্টারে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলতেই আমাকে বলা হল, এখন আর শিকাগোগামী কোন ফ্লাইট নেই। সকাল সাতটায় যেতে হবে। উল্লেখ্য, আমার গন্তব্য ‘ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট শিকাগো।’ দু’দিন পরেই আমার পিএইচডির ক্লাশ শুরু। তবে সবচেয়ে সুখের কথা হল, আমি ইন্টারন্যাশনাল এবং কাতার এয়ারওয়েজের যাত্রী হবার বদৌলতে আমাকে আবার টিকিট কাটতে হবে না। ওদিকে, সারারাত সোফায় ঘুমিয়ে ভিতরেই কাটিয়ে দেয়া যাবে অনায়াসে। টিকিট কাটতে হবেনা দেখে আমি এত খুশি হলাম, মনে হল প্লেনটা মিস করে খুব ভালো হয়েছে, না হলে এই আনন্দটা আমি পেতাম না। মনকে বলি, ‘দেখ আমি প্ল্যান করে প্লেনটা মিস করেছি’। মন মুচকি হাসে। বলে, ‘তাই বুঝি’?

শিকাগোর ও’হেয়ার এয়ারপোর্টে একসময়কার বুয়েটের ছাত্র বাংলাদেশী সিনিয়র ভাই আমাকে রিসিভ করতে আসবেন। তাকে ফ্লাইট মিস করার ব্যাপারটা জানাতে হবে। কয়েন-ফোন থেকে ফোন করতে যেতে না যেতেই, একটা মেয়ে নিজ থেকে এসেই ফোন দিয়ে বলল, ফোন করতে চাইলে তার ফোন থেকে করতে পারি। জিজ্ঞেস করলাম, পে’ করতে হবে না কি।’ হাসি মুখে বলল, ‘না।’ মনে মনে ভাবলাম, ‘বাহ! এখানকার মেয়েগুলোতো ভালোই।’ সিনিয়র ভাইকে ফোন করে বললাম, ‘আমি এই ফ্লাইটে আসতে পারছিনা, সকাল সাতটার ফ্লাইটে দিয়েছে।’ ভাইয়া বলে,‘ফাজলামি নাকি? ওদেরকে বল হোটেল দিতে। কোন ভাবেই ছেড়ে দিবা না।’ আমি মনে মনে বলি, ‘কে যে কাকে ছেড়ে দিচ্ছে, সেটা যদি আপনাকে বুঝাতে পারতাম।’ এবার আর কোন ভুল নয়, সকালে সব ঠিকঠাক করে প্লেনে উঠে সরাসরি ‘শিকাগো’র ‘ও’হেয়ার’ বিমানবন্দরে।এখানে আবার আরেক বিপত্তি। সব জায়গা খুঁজেও একটা লাগেজ খুঁজে পেলাম না। বিমানবন্দরের দু’জন কর্তব্যরত লোক আমার গতিবিধি সন্দেহজনক ভেবে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, ‘Can We help you Sir?’। আমার কি জানি কি হলো, আমি খুব ভাবসাব নিয়ে বললাম, ‘No’। এমনভাবে

বললাম যেন, 'আমার বাবা এ-শহরের মেয়র। তোরা আর আমাকে কি হেল্প করবি।' তারপরই মনে হলো, আরে আমারতো আসলেই হেল্প দরকার। এবার কাচুমাচু করেই বললাম, এই এই অবস্থা। এই লোকগুলোর একটা আশ্চর্য রকমের অসুখ আছে; এরা সবকিছুই হাসিমেখে করে। বলতে না বলতেই হাসিমুখে আমার টোকেন স্ক্যান করে, ভিতরের রুম থেকে লাগেজ বের করে দিল। ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

আমার সেই সিনিয়র ভাই, আগে থেকেই আমার থাকবার সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এবার বাসায় যাবার পালা। বিমানবন্দর থেকে বাসার পথে যেতে যেতে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে থাকলাম নতুন এক শহর। প্রথম দিন হয়তো অন্য আর সব দিনের থেকে অন্যরকম, কিছুই যেন দেখা থেকে বাদ দিতে চাইলাম না। রাস্তার দু'ধার, ট্রাফিক সিগন্যাল, বাহারী গাড়ী, দোতলা বাড়ী, সকালের আকাশ, বাস, ট্রেন, সব, সব, সবকিছু। শিকাগোর ডাউনটাউনের উঁচু উঁচু সব ভবনগুলোতো যেন একটা আরেকটার সাথে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। শহরের মাঝে ছোট্ট একটা নদীর মতো দেখলাম, নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, 'রিভার শিকাগো'। রাস্তাঘাট অনেক পরিচ্ছন্ন, সবকিছু গোছানো, পরিকল্পনামাফিক। সব দেখলাম একে একে, আর দেখলাম মানুষ। যে জিনিস আমাকে সবচেয়ে অবাক করে। হাজার রকমের মানুষ,তাদের আছে হাজার রকমের গল্প। হাজার রকমের ইতিহাস। ইচ্ছে করে সব ইতিহাস আমি জেনে ফেলি।

নিজের বাসাটা সবার আগে দেখে নিলাম। আমার ইউনিভার্সিটির পাশেই। খুবই পছন্দ হলো। পছন্দ হবার খেসারত হিসেবে মোটামুটি ডাবল ভাড়াই আমাকে গুণতে হবে। সাথে সাথে হিসেব করে দেখলাম ঠিক কয়মাস পর দেশে ফিরতে পারব। নাহ! মাস নয়, বছর। যে টাকা পাব, তা দিয়ে কোনভাবে থাকা খাওয়া যেতে পারে। প্রিয় মাতৃভূমিতে যেতে পারবো হয়ত কয়েক বছর পর; যখন বিমানের টিকিট কাটার টাকা জমবে। সেটা ভেবে হঠাৎ মনটাই খারাপ হয়ে গেলো। বাসা থেকে বের হয়ে সিনিয়র সেই ভাইয়ের বাসায় নাস্তা সেরে চলে গেলাম কেনাকাটায়। সরাসরি 'ডেভন' এলাকায়; বাংলাদেশি, পাকিস্তানি আর ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব ভুবন। 'ফিস মার্কেট' আর 'ফিস কর্নার'। কি চান আপনি? ইলিশ, রুই, কাতলা, টেংরা, বাটা, বোয়াল, কোরাল, মলা, চিংড়ী, রাঁধুনী গুঁড়া মশলা, পান, সুপুরি, ইস্পাহানি মির্জাপুর চা- অনেক কিছুই আছে। মুড়ির দামই দেখি বেশি, মুড়ি আর কচুর লতি। তিন ডলার দাম প্রতি প্যাকেটের। মুড়ি আর কচুর লতির দাম দেখে তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল; কত অবহেলাই না করেছি বাংলাদেশে। 'ডেভন' এসে কিন্তু মনটাই ভালো হয়ে যায়। সবদিকে যেন নিজেদের লোকজন, নিজেদের কালচার। কালচারের টান যে বড় টান।

দেশ নয়, এখানে আমাদের পরিচয় হয়ে উঠেছে একটা মহাদেশ। ভারতীয় উপমহাদেশ। আমরা সেখানকার, অতএব আমরা আপনজন। পাকিস্তানী হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে বাসার জন্য সব বাজার করে ফিরে আসলাম। বাজারতো বাজার- খালি রান্না করবার এত রকমের যন্ত্রপাতি কিনতে কিনতেই অস্থির হয়ে গেলাম। তবে কিছু জিনিস বাসার পাশের সুপার শপ থেকে কিনতে পারবো বলে 'ডেভন' থেকে নিয়ে আসলাম না।

‘ডেভন’ থেকে ফিরে এসে সেই সুপার শপেই গেলাম। সিনিয়র সেই ভাইও একসাথে সব কিনে দিচ্ছেন, উনার সাথে গাড়ি আছে। পরে উনি না থাকলে কিনবো কি করে? এখানেতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাহন ‘রিক্সা’ নেই। এই সুপার শপের আবার নিজস্ব কার্ড টাইপ আছে, যেটা দিয়ে ভালোই মূল্যছাড় পাওয়া যায়। আমি যথারীতি কাউন্টারের মেয়াটাকে জিজ্ঞেস করলাম,‘May I have card from here?’। উত্তরও আসলো, ‘Sorry Sir, We don’t sell car here.’ হায় কপাল, আমি বলি কি? আর সে বুঝে কি? ভাবলাম, কখন আসবে সেই দিন, যেদিন এরা আমার কথা বুঝতে পারবে, আমিও তাদের কথা বুঝতে পারবো?

এসবের ভিতর দিয়ে, এভাবেই কেটে গেলে হাজার মাইল দূরের এক শহরে আমার প্রথম দিন। প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম মেনে নেমে আসে রাত। রাতের নির্জনতায় জেগে থেকে ভাবি কতদূরে চলে এসেছি। কোথায় বাড়ি, কোথায় ঘর, কত পরিচিতজন, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন, কেউতো নেই এখানে, কেউ নেই। আবারো মনে হল, এতবড় পৃথিবীতে আসলে সব মানুষই একা। আর একদিন পরেই আমার ইউনিভার্সিটির ওরিয়েন্টেশান, অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস-এ রিপোর্ট করে যোগ দিতে হবে সেখানে। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরও পাইনি। (…চলবে)

পরশপাথর
অক্টোবার ৩০, ২০০৯
Poroshpathor81@yahoo.com